বাঙালীর বিজয়ের দিন

রাকিব হাসান

বাংলার মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে কঠোর হস্তে দমন করার লক্ষ্যে অপারেশন সার্চলাইটের নামে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকায় গণহত্যা শুরু করে। অপারেশন সার্চলাইটের মূল লক্ষ্য ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী,রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং পিলখানার ইপিআর এর বাঙালি জওয়ানদের নির্বিচারে হত্যা করা।এছাড়াও টেলিফোন,টেলিভিশন, রেডিও, টেলিগ্রাফসহ দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করা।আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীসহ ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের হত্যার মাধ্যমে ঢাকা শহরকে শতভাগ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসা।অপারেশন সার্চলাইটের প্রথম পর্যায় ঢাকা শহরের পাশাপাশি চট্টগ্রাম, খুলনা, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর, সিলেটেসহ বড়ো বড়ো শহরগুলোতে গণহত্যা শুরু করা হয়।গণহত্যা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আগে থেকেই পাকিস্তান আর্মিতে কর্মরত সকল বাঙালি অফিসারদের হত্যা কিংবা গ্রেফতারের চেষ্টা করা হয়। অভিযানের প্রথম রাতে শুধু ঢাকা শহরেই ত্রিশ হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকান্ডের সংবাদ যাতে বহির্বিশ্ব না জানতে পারে সে জন্য আগে থেকেই সকল বিদেশি সাংবাদিকদের গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় এবং অনেককে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়। ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১২ টা ৩০ মিনিটে (তখন ২৬ মার্চ) পাকিস্তান সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। গ্রেফতারের পূর্বে তিনি দলীয় নেতৃবৃন্দকে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেন এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা বিভিন্ন মাধ্যমে দেশবাসীসহ বিশ্ববাসী জানতে পারে।

মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলা এ সামরিক অভিযান প্রায় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তবে সবচেয়ে জঘন্য হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগরে।পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের মুখে খুলনা,বাগেরহাট, বরিশাল, ফরিদপুর জেলার লাখ লাখ হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ বিপুল সংখ্যাক মানুষ সাতক্ষীরা হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যাওয়ার লক্ষ্যে এখানে জড়ো হয়েছিল। আটালিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম হোসেন ছিলো শান্তি বাহিনীর সদস্য। আর চুকনগর বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে চলা ভদ্রা নদীর খেয়া ঘাটের ইজারাদার বিহারি শামসুদ্দিন খাঁ ও গোলাম হোসেন মিলে সাতক্ষীরায় পাকিস্তানি হানাদারের চুকনগরের খবর দেয়।

৭১ এর ২০ মে বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী একটি ট্রাক ও একটি জিপে করে মালতিয়া মোড়ের ঝাউতলায় আসে।তারপর গণহারে নিরীহ মানুষদের লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাস ফায়ারে হত্যা করে। আর এ হত্যাযজ্ঞ চলে বিকাল তিনটা পর্যন্ত। চার মাইল জুড়ে এ নিষ্ঠুরতম হত্যযজ্ঞ চলতে থাকে। ভদ্রা নদীর পানি সে দিন মানুষের রক্তে লাল হয়েছিল। এ নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের সঠিক সংখ্যা আজও জানা যায় নি।তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এই গণহত্যায় শহীদ হয়েছেন প্রায় বার হাজার নিরীহ মানুষ। যা ইতিহাসে চুকনগর হত্যাকান্ড নামে পরিচিত।

সময় যতো গড়াতে থেকে দেশের মুক্তি পাগল মানুষ মাতৃভূমি থেকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে থাকে।১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে বিদ্রোহ করা প্রায় ২৬ হাজার সুপ্রশিক্ষিত সদস্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর সাথে যুক্ত হয় হাজার হাজার মানুষ। তাদের কারো ছিল কয়েক দিনের প্রশিক্ষণ,আবার অনেকের কোন প্রশিক্ষণ ছিলোই না।তবে তাদের সবার মনোবল ছিল দৃঢ়।তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো দেশকে শত্রু মুক্ত করা, দেশকে স্বাধীন করা।মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ এ সমগ্র বাংলাদেশকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করে চারজন অধিনায়ককে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ গুলো হলে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা,সিলেট এবং দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল।পরবর্তীতে মুজিব নগর সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে ১০-১৭ জুলাই ১৯৭১ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে যুদ্ধ অঞ্চলের অধিনায়কদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।এই অধিবেশনেই যুদ্ধের কৌশলগত সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এক নম্বর সেক্টর ছিলো চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম,নোয়াখালীসহ ফেনীর মুহুরী নদীর পূর্ব পাড় পর্যন্ত। এই সেক্টরের পাঁচটি সাব সেক্টর ছিলো। নিয়মিত সৈন্য ছিলো ২ হাজার ১ শত এবং গেরিলা ছিলো ২০ হাজার। দুই নম্বর সেক্টর ছিলো কুমিল্লা জেলার কিছু অংশ, ঢাকা জেলার কিছু অংশ এবং ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। এ সেক্টরের ছয়টি সাব সেক্টর ছিলো। নিয়মিত সৈন্য ছিলো ৪ হাজার এবং গেরিলা ছিলো ৩০ হাজার। তিন নম্বর সেক্টর ঢাকা,কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলার কিছু কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। এ সেক্টরের নিয়মিত সৈন্য ছিলো ৬ হাজার ৬৯৩ এবং গেরিলা ছিলো ২৫ হাজার। এখানে সাব সেক্টর ছিলো সাতটি। চার নম্বর সেক্টর ছিলো সিলেট জেলার অংশ নিয়ে। এখানে নিয়মিত সৈন্য ছিলো ৯৭৫ জন আর গেরিলা ছিলো ৯ হাজার।এখানে সাব সেক্টর ছিলো ছয়টি । পাঁচ নম্বর সেক্টর ছিলো সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। এখানে সাব সেক্টর ছিলো ছয়টি, আর নিয়মিত সৈন্য ছিলো ১ হাজার ৯৩৬ জন।গেরিলা ছিলো ৯ হাজার। ছয় নম্বর সেক্টর দিনাজপুর ও রংপুর জেলার অংশ নিয়ে গঠিত। এখানে পাঁচটি সাব সেক্টর ছিলো। নিয়মিত সৈন্য ছিলো ২ হাজার ৩১০ জন এবং গেরিলা ছিলো ১১ হাজার। সাত নম্বর সেক্টর রংপুর,রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর জেলার কিছু কিছু অংশ ও পাবনা জেলা নিয়ে গঠিত। এখানে সাব সেক্টর ছিলো নয়টি। নিয়মিত সৈন্য ছিলো ২ হাজার ৩১০ জন এবং গেরিলা ছিলো সাড়ে বার হাজার। আট নম্বর সেক্টর যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, খুলনা ও বরিশাল জেলার অংশ নিয়ে গঠিত। এখানে সাব সেক্টর ছিলো সাতটি। নিয়মিত সৈন্য ছিলো ৩ হাজার ৩১১ জন এবং গেরিলা ছিলো ৮ হাজার। নয় নম্বর সেক্টর ছিলো বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা, ও ফরিদপুর জেলার অংশ নিয়ে গঠিত। এখানে সাব সেক্টর ছিলো তিনটি।নিয়মিত সৈন্য ছিলো ৩ হাজার ৩১১ জন এবং গেরিলা ছিলো আট হাজার। দশ নম্বর সেক্টর ছিলো নৌ-কমান্ডোদের নিয়ে। নৌ-কমান্ডোদের সংখ্যা ছিলো ৫১৫

জন।বিভিন্ন নদী বন্দর ও শত্রু পক্ষের নৌ-যানগুলোতে অভিযানের জন্য তাদের বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হতো।আর এগারো নম্বর সেক্টর ছিলো ময়মনসিংহ, সিলেট ও রংপুর জেলার অংশ নিয়ে গঠিত। এখানে সাব সেক্টর ছিলো সাতটি। নিয়মিত সৈন্য ছিলো ২ হাজার ৩১০ এবং গেরিলা ছিলো ২৫ হাজার।

এসব সেক্টরের দায়িত্বপ্রদপ্ত সেক্টর কমান্ডাররা তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।অসীম সাহসের সাথে যুদ্ধ করতে থাকে। এখানে উল্লেখ্য কম- বেশি ৩৫ জন অফিসার ও ক্যাডেট এবং ৫ শত বিমান সেনা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তি যুদ্ধে অংশ নেয়।

অক্টোবর মাসের মধ্যে পাকবাহিনী মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে কোন ঠাসা হয়ে সীমান্ত এলাকা ছেড়ে সেনানিবাস অথবা বড়ো বড়ো শহরে চলে আসে। এসময় দেশের প্রায় আশি শতাংশ এলাকা শত্রু মুক্ত হয়।নভেম্বর মাসেও মুক্তিবাহিনীর নতুন নতুন এলাকা মুক্ত করার অভিযান অব্যহত থাকে। এর মধ্যে ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান অতর্কিতভাবে ভারত আক্রমণ করলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। ৪ ডিসেম্বর ভারতীয় স্থলবাহিনী মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি যুক্ত হয়ে যায়। যৌথ বাহিনীর আক্রমণে পাকবাহিনী একেবারেই কোন ঠাসা হয়ে পড়ে। ৬ ডিসেম্বর ভূটান ও ভারত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে মুক্তিবাহিনীর মনোবল বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ৬ ডিসেম্বর সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পাকিস্তানী নবম ডিভিশনের সাথে ভারতীয় নবম পদাতিক ও চতুর্থ মাউন্টেন ডিভিশনের প্রচন্ড লড়াই হয়।ব্রিগেডিয়ার হায়ত রাতের আধারে যশোর সেনানিবাস থেকে পালিয়ে খুলনায় চলে যায়,আর এভাবেই যশোর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এদিন মেহেরপুর ও শত্রুমুক্ত হয়। ৭ ডিসেম্বর চুয়াডাঙ্গা, সাতক্ষীরা, গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নোয়াখালী, ঝিনাইদহ ও মৌলভীবাজার শত্রু মুক্ত হয়।মিত্র বাহিনী মুক্ত করে সিলেট শহরকে।

জেনারেল রাও ফরমান আলী তার " হাউ পাকিস্তান গট ডিভাইডেড" বইয়ে লিখেছেন "---- পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলার জন্য ৭ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজীকে ডেকে পাঠান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডা. এম এ মালেক।---- গভর্নর বলতে শুরু করলেন যুদ্ধে যে-কোনো কিছুই ঘটতে পারে --- তখন এক পক্ষ জেতে অন্য পক্ষ হারে। -------- এ সময় জেনারেল নিয়াজী তার দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুফিয়ে ফুফিয়ে কাঁদ ছিলেন।সে-সময় একজন পরিচারক চা নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলে তাকে দ্রুত বের করে দেওয়া হয়। সে পরে বাইরে গিয়ে বলে ভেতরে সাহেবরা কান্নাকাটি করছে। খবরটি দ্রুত ঢাকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। " চারদিক থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরাজয়ের খবর আসতে থাকে।

সমন্বিত যুদ্ধ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সম্মিলিত বাহিনী প্রচন্ড বেগে অগ্রসর হয়ে পাকবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে এবং দ্রুততম সময়ে রাজধানীর উপকণ্ঠে চলে আসে।অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর '৭১ দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে বিকাল ৪ টা ৩১ মিনিটে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ৯৩ হাজার সৈন্য বিনা শর্তে সম্মিলিত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে।আত্নসমর্পণের দলিলে পাকবাহিনীর পক্ষে জেনারেল নিয়াজী এবং সম্মিলিত বাহিনীর পক্ষে লেঃ জেনারেল জগজিত সিং অরোরা স্বাক্ষর করেন।এ-সময় বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন মুক্তিবাহিনীর উপ- সেনা প্রধান ও বিমান বাহিনী প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার, এস ফোর্সের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল কে এম সফিউল্লাহ, ২ নম্বর সেক্টরের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর এ টি এম হায়দার এবং টাঙ্গাইল মুক্তি বাহিনীর অধিনায়ক জনাব কাদের সিদ্দিকী।

অবশেষে পাকিস্তানের অপশাসনের বিরুদ্ধে ২৪ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রামের ফসল রক্তের বিনিময়ে এলো অনেক ত্যাগের স্বাধীনতা।প্রকৃত নিয়মেই মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে।আগামী দশকের মধ্যে আমারা হয়তো আমাদের সূর্য সন্তানদের হারিয়ে ফেলবো।তাঁদের ত্যাগ ও আদর্শ আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে।এজন্য মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দেওয়া, সঠিক ইতিহাস জাগ্রত রাখার দায়িত্ব সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে নিতে হবে।